একক ৬ □ প্রাক্-চৈতন্যযুগের মঙ্গলকাব্য

গঠন

৬.১ প্রস্তাবনা

৬.২ মূল আলোচনা

৬.৩ মনসামঙ্গল কাব্যের ধারা

৬.৩.১ কানা হরিদত্ত

৬.৩.২ বিজয় গুপ্ত

৬.৩.৩ বিপ্রদাস পিপিলাই

৬.৩.৪ নারায়ণ দেব

৬.৪ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ধারা

৬.৪.১ মানিক দত্ত

৬.৫ অনুশীলনী

৬.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৬.১ প্রস্তাবনা

এই এককটি পাঠ করলে আপনি মঙ্গলকাব্য সৃষ্টির সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাটপট সম্পর্কে জানতে পারবেন। 'মঙ্গল' নামের তাৎপর্য অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন। দীর্ঘ চারশ' বছর ধরে কত রকমের মঙ্গলকাব্য লেখা হয়েছে সে বিষয়ে হদিস করতে পারবেন। দেবী মনসার উত্থান ঘটলো কীভাবে তা জানা যাবে। চৈতন্যপূর্ব যুগে কানা হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই ও নারায়ণ দেব যে মনসামঙ্গল কাব্য লিখেছিলেন তাঁদের ব্যক্তি পরিচয়সহ কাব্যগুলির সামগ্রিক পর্যালোচনা করতে পারবেন। ভারতীয় সংস্কৃতিতে দেবী চণ্ডীর আবির্ভাব কেমন করে ঘটলো এবং বাংলা মঙ্গলকাব্যে কবে থেকে তিনি বন্দিত হতে লাগলেন এ বিষয়ে জানতে পারবেন। প্রাক্-চৈতন্যযুগের কবি বলে অনুমতি একমাত্র চণ্ডীমঙ্গলকার মানিক দত্ত সম্বন্ধে ও তাঁর কাব্য সম্পর্কে স্তিারিত জানতে পারবেন।

৬.২ মূল আলোচনা

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য নিঃসন্দেহে একটি বলিষ্ঠতর ধারা। অনুবাদ কাব্যের মতো এরও প্রধান নির্ভর আখ্যান, তবে এর কোনো সংস্কৃত-মূল কাহিনী উৎস নেই। গ্রাম-বাংলার ব্রতকথাগুলি যেমন লোকসমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার বৃন্তমূল থেকে স্বতোৎসারিত হয়েছিল একদিন, তেমনি অগণিত বাঙালির ঐহিক কামনা-বাসনার রূপায়ণ ঘটেছে মঙ্গলকাব্যগুলির পাতায়। বস্তুত লৌকিক দেবদেবীদের পূজাপ্রাপ্তি ও মাহাত্ম্য প্রচারের গল্পের কোনো জড় খুঁজে পাওয়া যাবেনা কোন প্রতিষ্ঠিত পুরাণে। বরং এগুলির মধ্য দিয়ে সেদিনের বাঙালির দৈনন্দিন জীবনচর্যার অনেক হদিস খুঁজে পাওয়া যায়। কাহিনী, চত্রি, পটভূমি, মেজাজ—সব কিছুতেই মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ বাংলাদেশকে

এমনভাবে পাওয়া যায় যা আর কোন মধ্যযুগীয় সৃষ্টিতেই মেলে না। এজন্য মঙ্গলকাব্যকে অনেকে প্রাচীন বঙ্গের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ফসল বলেও গণ্য করেন। সমকালীন সমাজের ওপর প্রভাব বিস্তারে এটি একমাত্র তুলিতে হতে পারে বৈষ্ণব সাহিত্যের সঙ্গে। রাধাকৃষ্ণের আপার্থিব প্রেমকথা ভাবালু বাঙালির রোমান্টিক আকাঙ্ক্ষা যেভাবে পূরণ করেছিল, সেভাবে মঙ্গলকাব্যে দেবতা ও মানুষের দ্বন্দ্ব-সংঘাত-মিলন তার বস্তুমুখী জীবনতৃষ্ণাকে অনেকাংশে মেটাতে সফল হয়েছিল। বৈষ্ণব পদাবলির শেষ গন্তব্যস্থল ছিল মরমীয়া অতীন্দ্রিয়বাদে, আর মঙ্গলকাব্য পৌঁছে দিয়েছিল অলৌকিকতা-সংস্পৃক্ত বস্তুবাদে।

প্রসঙ্গত 'মঙ্গল' নামের উৎপত্তি বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করা যেতে পারে। কেউ বলেন, শব্দটি তৈরি হয়েছে সুভাষণরীতি থেকে। ভয়ঙ্কর ও প্রতিহিংসা-পরায়ণ দেবতাকে তুষ্ট করতে গিয়ে কিংবা তাঁদের অমঙ্গলকারিণী শক্তিকে প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে সমাজমন তৈরি করে নিয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীতার্থক শব্দ 'মঙ্গল'। অন্য কোন পণ্ডিত শব্দটি উৎস খোঁজেন দ্রাবিড় ভাষার মধ্যে, যা বিবাহ-সম্পর্কিত কোন বিষয়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বলে মনে করা হয়। কারণ মালয়ালম্ ভাষায় 'মঙ্গল্যম্'-এর অর্থ বিবাহ, তামিল ভাষায় বিবাহাদি অনুষ্ঠানে ক্ষৌরকর্মের জন্য ব্যবহৃত ক্ষুর, আর তেলুগুতে 'মঙ্গল' বলতে বোঝায় ক্ষৌরকার। এক্ষেত্রে উল্লেখ থাকে যে, কুর্গ অঞ্চলে নানাবিধ সামাাজিক অনুষ্ঠানকেই 'মঙ্গাল' শব্দে অভিহিত করা হয়ে থাকে। আবার অন্য ভাবনার সমালোচকেরা 'মঙ্গল' শব্দের উৎস খুঁজে পান রাগসঙ্গীতের নামাবলীর মধ্যে। নারদের মতে, ভৈরব রাগের পুত্রবধূ হল 'মঙ্গলকৌশিকী', আর ক্ষেমকর্ণ পাঠকের মতে মঙ্গলরাগ হিন্দোল রাগেরই অন্তর্গত একটি উপরাগ। তবে একথা সত্য যে, মঙ্গলকাব্য সব সময় মঙ্গলরাগে গীত হতো না। 'মঙ্গল' নামের হদি পেতে কেউ কেউ কাব্যটির সময় নির্ভর গীতি-বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এক মঙ্গলবার থেকে অন্য মঙ্গলবার পর্যন্ত এটি গান গাওয়া হতো বলে এর অভিধা নাকি মঙ্গলকাব্য। কিন্তু তথ্য হিসেবে মনে রাখা বাঞ্ছনীয় যে, ধর্মমঙ্গল পালা বারো দিনে উপস্থাপিত হতো সূর্যের সংখ্যা দ্বাদশ আদিত্যের সঙ্গে মিলিয়ে। উপরোক্ত সমূহচিন্তায় বোধহয় কাব্যের প্রকৃতিকে সেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তাই কোন কোন সমালোচক ভিন্ন ভাবনার কথা বলেন। তাঁদের মতে, মর্ত্যভূমিতে নিজ মাহাত্ম্য প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং ভক্তগণের মঙ্গল বিধানের জন্য যেসব লৌকিক দেবদেবীর অলৌকিক মহিমার কথা একদা ব্রত পাঁচালির আকারে প্রচারিত হয়েছিল, পরর্তীকালে তাদের কাব্যরূপগুলিই 'মঙ্গলকাব্য' নামে সাধারণ্যে পরিচিত হয়। কোন যুগপ্লাবী বিশেষ ঘটনা ও বিপন্ন মানবচৈতন্যের তাগিদ এর সঙ্গে যুক্ত আছে বলে পণ্ডিতদের ধারণা।

রবীন্দ্রনাথ যদিও বলেছেন, সমাজে প্রসারিত শৈব প্রভাবের বিরুদ্ধে শক্তির উত্থানই মঙ্গলকাব্যগুলির প্রেরণা, তবুও সব মঙ্গলকাব্যে এই ছকটিকে মিলিয়ে নেওয়া যায় না। M. N. Srinivas-এর মতে, আর্যসভ্যতার ক্রমিক বিস্তারের ফলে যে সংস্কৃতায়নের সূচনা ঘটে, মঙ্গলকাব্যের লৌকিক দেবদেবীদের উচ্চবর্ণভূক্তির চেষ্টা নাকি তারই স্মরক। কিন্তু এর বিপরীত ভাবনাটিও সমানভাবে বিবেচ্য। অর্থাৎ উচ্চবর্ণের দিক থেকে নিম্নতলস্থ দেবদেবীদের জাতে তোলার চেষ্টা ব্যাপারটি বিচার সাপেক্ষ বিষয়, যেখানে তথাকথিত উচ্চ অভিজাতরাই মঙ্গলকাব্য নিয়ে উক্ত দেবদেবীদের মাহাত্ম্য প্রচারে সাহায্য করেছেন, বিপরীতটা নয়। একথা এখন খুব স্পষ্ট যে, অন্ধতা-অজ্ঞতা-অদৃষ্টবাদ-ভীতিবোধ তথা আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস যখন দৃঢ়ভাবে চেপে বসেছিল বাঙালি জনমানসে, তখন সেই প্রেক্ষাপটে মঙ্গলকাব্য সমূহের উদ্ভব। যে প্রয়োজন ও আততির সঙ্গে বাংলা মঙ্গল কাব্যগুলোর যোগ তা একান্তভাবে সেকালের বাস্তব সমস্যা ছিল। তুর্কী আক্রমণের কালে নতুন শক্তির অত্যাচার ও বলাৎকৃতির সামনে বাঙালির জাতীয় জীবন বিমূঢ় হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় দরকার পড়ছিল উদ্ধত ইসলামের বিরুদ্ধে হিন্দুর একত্র

সংহতির অথচ সমাজের অন্ত্যেবাসী মানুষরা বৃহত্তর হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েও বর্ণাশ্রমী ব্যবস্থার শাসনে-শোষণে কেবল নির্যাতন ভোগ করছিল। তাদের সঙ্গে উচ্চবর্ণের মানুষের মানসিক যোগাযোগ আদৌ ছিল না। নতুন রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থায় হিন্দুসমাজে বড় ফাটল দেখা দিলে স্বার্থনির্ভর জাতিচেতনায় উদ্বুদ্ধ অভিজাত হিন্দুরা নীলরক্তের উন্নাসিকতাকে দূরে সরিয়ে রেখে এতকালের অবহেলিতদের পাশে এসে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। বর্ণাশ্রমীদের কঠোর অনুশাসন এই পরিপ্রেক্ষিতেই শিথিল হতে শুরু হয়, আর তার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে অপৌরাণিক দেবদেবীদের স্বীকৃতি দিতে থাকেন পৌরাণিক সংস্কৃতির অন্তর্গত বিদগ্ধ জন।

পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত লাগাতার মঙ্গলকাব্য অনুশীলিত হওয়ায় এর রচনাভঙ্গিতে কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। যেমন, বন্দনা, গন্থোৎপত্তির কারণ, দেবখণ্ড ও নরখণ্ডে সব মঙ্গলকাব্য বিভক্ত হবে। তাতে থাকবে চৌতিশা, বারমাস্যা, ফলফুলবৃক্ষ বিহঙ্গের তালিকা, ভোজ্যদ্রব্যের তালিকা, বিবাহের বিশদ বর্ণনা, যুদ্ধের বর্ণনা ইত্যাদি। দেবতারা স্বর্গলোক থেকে কাউকে শাপভ্রষ্ট করে পাঠাবেন মর্ত্যভূমিতে। অতঃপর নানা প্রতিকুলতা জয় করে উক্ত দেব কিংবা দেবীর পূজা প্রচার করে আবার ফিরে যাবেন স্বর্গলোকে। সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা, পৌরাণিক দেবদেবীর বর্ণনা, দিগ্বন্দনা, নারীগণের পতিনিন্দা ইত্যাদি বিষয়ও মঙ্গলকাব্যের আবশ্যিক উপাদান বলে গণ্য। রচনার ঐতিহাসিক কালানুক্রম বিচার করলে দেখা যায়, অনার্য-মূল দেবদেবীদের পূজা প্রচারের কাহিনী দিয়ে মঙ্গলকাব্যধারার সূচনা ঘটলেও অচিরে তা বৈদিক ও পৌরাণিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের মাধ্যমে পরিণত হয়। অবশ্য সার্বিকভাবে এরা সকলেই 'মঙ্গল' নামযুক্ত হলেও প্রভাব ও প্রাচুর্যের দিক থেকে সমগ্র মঙ্গল সাহিত্যকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায় :

ক. প্রাথমিক তথা প্রধানস্তরের মঙ্গলকাব্য—মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল।

খ. মধ্যস্তরের জনপ্রিয় মঙ্গলকাব্য—কালিকামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, রায়মঙ্গল, গৌরীমঙ্গল ও শীতলামঙ্গল।

গ. গৌণস্তরের মঙ্গলকাব্য—অনাদিমঙ্গল, কমলামঙ্গল, কিরীটিমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, জীমূতমঙ্গল, পঞ্চাননমঙ্গল, লক্ষ্মীমঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সূর্যমঙ্গল।

মঙ্গলকাব্যের রূপাঙ্গিক এতটাই জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, লৌকিক, পৌরাণিক ও বৈদিক দেবতাদের পাশাপাশি বৈষ্ণবদেবতাকে ঘিরেও মঙ্গলকাব্য রচনার প্রচেষ্টা চলে। এর প্রমাণ রয়েছে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, রসিকমঙ্গল, রাধিকামঙ্গল, গোপালমঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল, ব্রজমঙ্গল ইত্যাদি গ্রন্থে। প্রাক-চৈতন্যযুগে প্রধানস্তরের মঙ্গলকাব্যগুলিই কেবল বিকশিত হয়েছিল। ঐ তিনটি বলিষ্ঠ ধারার মধ্যে আবার মনসা ও চণ্ডীকেন্দ্রিক মঙ্গলকাব্যের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। ধর্মমঙ্গলের সূচনা বোধহয় শ্রীচৈতন্যের জন্মের পর ষোড়শ শতকে। অতএব আমাদের নির্ধারিত পর্বে আলোচ্য হয়ে ওঠেন মনসামঙ্গলের কবি কানা হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই ও নারায়ণ দেব এবং অন্যদিকে চণ্ডীমঙ্গলের কবি মাণিক দত্ত।

৬.৩ মনসামঙ্গল কাব্যের ধারা

সর্পদেবী মনসার মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচলনের কাহিনী নিয়ে মনসামঙ্গল কাব্যধারার প্রতিষ্ঠা। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই সর্প হিংস্র বিষধর এক প্রাণী। তার এক মোক্ষম ছোবলেই মানুষের প্রাণান্ত। এই আধিভৌতিক সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এককালে বিপন্ন মানুষ সর্গের অধিষ্ঠাত্রী এক দেবীর কল্পনা করেছিল, যিনি বঙ্গদেশে কালক্রমে মনসা নামে

পরিচিতা হয়েছে। পণ্ডিতগণের অভিমত, সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতে সর্পপূজা প্রচলিত থাকলেও সর্প-সংস্কৃতির সূচনা ঘটেছিল প্রাচীন মিশরে প্রায় ছয় হাজার বছর আগে। ইউফ্রেটিস তীরবর্তী তুরানী জাতির মানুষি নাকি প্রথম সর্পপূজার প্রচলন করে। তারপর এই জাতির শাখা বিভিন্ন দেশে উপনিবিষ্ট হলে সেইসব অঞ্চলে সর্পপূজা বিস্তৃত হয়। ভারতে আর্যরা আসার পূর্বে দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষরাই সাপকে ঘিরে নানারকমের ধারণা ও সংস্কার গড়ে তোলে। পরে এর প্রভাব এসে পৌঁছয় পৌরাণিক হিন্দুশাস্ত্রে। মনসা কোথাও সর্পাভরণা, কোথাও সর্পধিষ্ঠাত্রী দেবী, আবার কোথাও বা নিজেই সর্পরূপিনী। বাংলাদেশে একাদশ শতকের আগে ভাস্কর্য শিল্পে দেবী মনসার চিহ্ন মিলেছে। চৈতন্য ভাগবতে পঞ্চদশ শতকের শেষবাগে বাঙালি সমাজে বিষহরি পূজার কথা উল্লেখিত।

মনসামঙ্গলের কাহিনী বাংলার আদিম লোকসমাজের সর্পপূজার ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত। বৈদিক আর্যদের সঙ্গে সর্পের পরিচয় প্রথমাবধি ছিল না বলে মনে হয়। যজুর্বেদের কাল থেকে তাঁদের মধ্যে সর্পজ্ঞান ক্রমশ বিকশিত হয়েছে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বৌদ্ধ সর্পদেবী জাঙ্গুলিক মনসার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছেন। জাঙ্গুলি প্রকৃতপক্ষে বিষবিদ্যা। তান্ত্রক বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থাদিতে আরো একজন সর্পাধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম পাওয়া যায়। ইনি হলেন কুরুকুল্লা— সর্প ও সর্পবিষের নিয়ন্ত্রী। দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় গোষ্ঠীর সর্পদেবী 'মন্‌চা অম্মা'। ক্ষিতিমোহন সেনের মতে, এই দেবী পরে 'মনসা মা'-তে পরিণত হয়েছেন। মনসাকে যাঁরা পৌরাণিক দেবীর রূপান্তর বলে মনে করেন ড. সুকুমার সেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি মনে করেন নানা দেব ভাবনা ও রপকল্পনা বিভিন্ন সময়ে মিলেমিশে গিয়ে মনসার পরিচিত মূর্ত্তি গঠন করেছে। এই উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে বৈদিক ইলা, সরস্বতী শ্রী, বৈদিক বাক্, গৌরী, বৈদিক সর্পরাজ্ঞী বা বসুন্ধরা, পরবৈদিক কমলাসনা, দেবী, পরবৈদিক নাগলাঞ্ছন দেবী এবং লৌকিক বাস্তুদেবতা। মহাভারতের যুগে মনসাকে নিয়ে জরৎকারু ও আস্তিককেন্দ্রিক গল্প রচিত হয়। দশম-একাদশ শতাব্দীতে রচিত পদ্মপুরাণ, দেবী ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মতো অর্বাচিন পুরাণগুলিতে মনসার বিস্তারিত উল্লখ দেখা যাচ্ছে। মনসামঙ্গলের গল্পসূত্রে যেটা মনে হয় সেটা হল, মনসার পূজা প্রথমে অভিজাত হিন্দু সমাজ মেনে নেয়নি। জেলেও দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে তিনি পূজা পেতেন। মহিলাদের দ্বারা বন্দিত হওয়ার কারণে তাঁকে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের দেবী বলে ধারণা করতে হয়। অবশেষে এই দেবী বৃহত্তর হিন্দু সমাজে পূজা হয়ে উঠলেন চাঁদ সদাগরের সঙ্গে বিরোধিতার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠায়। অতএব সিদ্ধান্ত করতে হয়, সর্পধিষ্ঠাত্রী দেবীর উপাসনা পৃথিবীর আদিমতম ধর্মসংস্কারগুলির অন্যতম। ইনি একই সঙ্গে পশু-পূজা, বৃক্ষপূজা, নদী উপাসনা এবং মাতৃকা আরাধনার ধারাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছেন। শিব-কন্যা হিসেবে ইনি গৃহীতা হলে অনার্যদেবীর আর্যীকরণ ঘটে এবং তখনই শিবের কন্যা লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সঙ্গে সমীকৃতা হন। তাঁর জন্ম সংক্রান্ত দুটি কাহিনীই প্রাগার্য উৎসের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করে। বর্তমানে মনসাপূজার মন্ত্র পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির দান হলেও কিছু কিছু প্রয়োজনীয় উপাচারের উপস্থিতি সেই প্রাগার্য ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মনসামঙ্গল গান এই মনসপূজারই অঙ্গ। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে নানা সময়ে আবির্ভূত কবিরা একই কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করলেও সকলে সমান প্রতিভা সম্পন্ন কবি ছিলেন না। তাঁদের লেখায় আখ্যান, চরিত্র, বক্তব্যে, উপস্থাপনায় বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়। সকলের শিল্পচেতনা অভিন্ন না হওয়ায় স্বাদবৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা কবিদের আলোচনায় মুখ্যত সেইসব পার্থক্যগুলি অন্বেষণের চেষ্টা করবো।

৬.৩.১ কানা হরিদত্ত

পারিপার্শ্বিক বাহ্য প্রমাণসূত্রে যতদূর অনুমান করা যায় তাতে মনে হয় মনসামঙ্গলের কাহিনী প্রথম কাব্যরূপ লাভ করে কানা হরিদত্তের হাতে। পূর্ববঙ্গের কবি বিজয় গুপ্ত পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকে কাব্য লিখতে গিয়ে উল্লেখ

করেছিলেন কানা হরিদত্তের নাম। বেশ কড়া সমালোচনার সুরে বলেছিলেন—

'মুর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য ।
প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত ॥
হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হৈল কালে ।
যোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে ॥
কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর ।
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর ॥'

কবির কাব্য সম্ভবন্ধে একথা বলার মতো জোরালো কিছু আমাদের হাতে নেই। তাঁর কাব্য আমাদের কালে এসে পৌঁছয়নি, এমনকি বিজয় গুপ্তের সাক্ষ্য যদি সঠিক হয় তাহলে পনের শতকের শেষভাগে তা লুপ্ত ছিল। অতএব যে-কাব্য সমালোচক নিজে দেখেননি, তার বিরুদ্ধে এ ধরনের কটুকাটব্য কতটা যুক্তি সঙ্গত তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে পড়ে। পক্ষান্তরে এটা হতে পারে যে, বিজয় গুপ্ত নিজের কাব্যকে গৌরান্বিত করে তোলার জন্য এ হেন ধ্বংসাত্মক সমালোচনায় মেতে ছিলেন। যাইহোক, বিজয় গুপ্তের কাছ থেকে একটা খাঁটি খবর পাওয়া গেছে যে, কানা হরিদত্তই মনসার প্রথম গীত রচয়িতা। নারায়ণ দেবের একটি পুথিতেও হরিদত্তকে এই দুর্লভ সম্মানের অধিকারী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। হরিদত্ত সম্ভবন্ধে আর একটু তথ্য মেলে পুরুষোত্তম নামক গায়েনের উল্লেখ থেকে, যিনি হরিদত্ত রচিত লাচাড়ির ছন্দ গান করতেন। গায়েনের ভণিতাটি এইরকম—'কানা হরিদত্ত/হরির কিঙ্কর/মনসা হইক সহায়। তার অনুরুধ্ব/লাচাড়ীর ছন্দ/লাচাড়ীর ছন্দ/শ্রীপুরুষোত্তম গায়।'

হরিদত্ত সম্বন্ধে কেউ কেউ অনুমান করেছেন যে, তিনি ছিলেন পূর্ববঙ্গের লোক। ময়মনসিংহের দিগ্‌পাইৎ গ্রাম থেকে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয় একটি প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার করেছিলেন। ঐ পুথিতে কানা হরিদত্তের ভণিতাযুক্ত 'পদ্মার সর্পসজ্জা' নামধেয় একটি শিকলি পাওয়া গিয়েছে। সেইসূত্রে গবেষক মহলে ধারণা যে, কবি ময়মনসিংহের মানুষ ছিলেন। এ কবির কাল নির্ধরণেরও চেষ্টা হয়েছে। শ্রদ্ধেয় দীনেশচন"র সেনের মতে ইনি দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন এবং সম্ভবত তুর্কী আক্রমণের আগেই কাব্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু এমত নানা কারণে মেনে নেওয়া যায় না। নানার প্রধানতম বাধা এর ভাষা। দক্ষিণারঞ্জনবাবু প্রাপ্ত পুথিটির যে-অংশ নকল করে দীনেশচন্দ্রকে পাঠান তার মুদ্রিত রূপ দেখে পণ্ডিত মহলেই সংশয় জেগে ওঠে। কারণ সে ভাষায় আধুনিকতার ছাপ যথেষ্ট। আবার বিজয়গুপ্তও যে-ধরনের সমালোচনা করেন তা আদৌ সমর্থিত হয় না ঐ রচনায়। মুদ্রিত কাব্যাংশের কিয়দংশ এইরকম—

'দুই হাতের সঙ্খ হইল গরল সঙ্খিনী ।
কেশের জাত কৈল এ কাল নাগিনী ॥
সুতলিয়া নাগ কৈল গলার সুতলি ।
দেবি বিচিত্র নাগে কৈল হৃদয়ে কাঁচুলী ॥
সিন্দুরিয়া নাগে কৈল সিত্যের সিন্দুর ।
কাজুলিয়া কৈল দেবীর কাজল প্রচুর ॥'

বিজয় গুপ্তর কাব্যরচনাকালে (১৪৮৪ খ্রিঃ) যদি হরিদত্তের গীত সত্যসত্যই লুপ্ত হবার মুখে পড়ে তাহলে চতুর্দশ শতকের প্রথমভাগে এই কবি আবির্ভূত হতে পারেন বলে অনুমান করা যায়। আর এই সময়েই ব্রতকথার

সংকীর্ণ ভুমি ছেড়ে কাব্যের মধ্যে মঙ্গলকাহিনীগুলি যে রূপ পাচ্ছিল তার পরোক্ষ প্রমাণ মিলেছে চৌতিশাস্তবের সংযুক্তিতে। প্রাসঙ্গিক তথ্য হিসেবে স্মরণীয় যে, চৌতিশার সংস্কৃত অবয়বটি প্রথম উপস্থাপিত হয় ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সংকলিত বলে অনুমিত বৃহদ্ধর্মপুরাণে।

৬.৩.২ বিজয় গুপ্ত

পূর্ববঙ্গে পদ্মাপুরাণের বিশিষ্ট জনপ্রিয় কবি হলেন বিজয় গুপ্ত। তাঁর কাব্য একদা বরিশাল অঞ্চলে খুব প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন গায়েনের মুখে মুখে বিজয় গুপ্তের রচনা এতটা পরিবর্তিত হয়ে গেছে যে কবির নিজের লেখা রূপটি তাঁর থেকে উদ্ধার করা শক্ত। তাঁর লেখায় আধুনিক শব্দ, নতুন পালা, আকর্ষণীয় বর্ণনা যে পরে সংযুক্ত হয়েছে এবং সেটা কাব্যটির বিপুল জনপ্রিয়তার জন্যই সেকথা বলা বাহুল্য মাত্র। বিজয় গুপ্তের পুথি প্রথম সম্পাদনা করেন বরিশালের ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্যারীমোহন দাশগুপ্ত ১৩০৩ বঙ্গাব্দে। সেই গ্রন্থ থেকে কবি সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। গ্রন্থসূচনায় কবি আত্মপরিচয় বিবৃত করেছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, মুলুক ফতেহাবাদের অন্তর্গত ফুল্লশ্রী গ্রামে কবি জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামটির পশ্চিমে ঘাসর ও পূর্বে ঘণ্টেশ্বর নদী। কবির জন্ম শিক্ষিত বৈদ্যবংশে। ফুল্লস্রী পরে গৈলা-ফুল্লশ্রী নামে পরিচিত হয়। বিজয় গুপ্তের কাব্যের নাম 'পদ্মাপুরাণ'। এর রচনাকাল নিয়ে বিতণ্ডা আছে। একাধিক পুথিতে তিনটি সময় হেঁয়ালির ভাষায় উল্লেখিত। এগুলি যথাক্রমে 'ঋতু শশী বেদ শশী', 'ছায়াশূন্য বেদশশী' ও 'ঋতু শূন্য বেদ শশী', যাদের থেকে ১৪৯৫, ১৪৭৮ ও ১৪৮৪ খিস্টাব্দ পাওয়া যায়। কবি প্রতিটি ক্ষেত্রেই সুলতান হুসেন শাহার নামোল্লেখ করেছেন। কিন্তু কে এই হুসেন শাহ? ইনি যদি আলাউদ্দিন হুসেন শাহ হয়ে থাকেন তাহলে ১৪৯৩ সালে সিংহাসনরোহন করেন এবং মাত্র এক বছরের মধ্যেই তাঁর রাজ্যশাসনের খ্যাতি সুদুর বরিশালে পৌঁছানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। বরং মুলুক ফতেহাবাদের সূত্রে কেউ কেউ এক্ষেত্রে জালালুদ্দিন ফতেহ শাহের সময়কে নির্দেশ করতে চান। ইনি প্রজাসাধারণের কাছে হোসেন শাহ নামে পরিচিত ছিলেন। রাজত্ব করেছেন ১৪৮১-১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁর নামেই মুলুক ফতেহাবাদ চিহ্নিত হয় ও এখানকার টাঁকশাল থেকে তাঁর কতকগুলি মুদ্রা উৎকীর্ণ হয়। 'ঋতু শূন্য বেদ শশী' পাঠ যে পুথিতে মিলেছে সেটি কবির নিজের গ্রাম গৈলা ফুল্লশ্রীতে প্রাপ্ত। এই গ্রামে বিজয় গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত মনসার মন্দির ও মন্দিরে পিতলের মনসামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কবির দেওয়া তথ্যানুযায়ী তাঁর পিতার নাম সনাতন ও মাতার নাম রুক্মিনী।

বিজয় গুপ্তের কাব্য বেস আয়তনবিশিষ্ট। তিনি সমস্ত কাহিনীকে মোট আঠাশটি পালায় বিভক্ত করেছেন। বিজয় গুপ্তের রচনাসূত্রে আমরা পুরা মনসামঙ্গল কাহনী সম্পর্কে সার্বিক ধারণা করতে পারি। তাঁর বর্ণিত কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরকম—নারদের কৌশলে চণ্ডী রচিত নন্দন কাননে শিব একদা প্রবেশ করলে পুষ্প সৌরভে আমোদিত হয়ে মনে মদন পীড়া অনুভব করলেন। তাঁর বীর্য স্খলিত হলো। তিনি তা নিক্ষেপ করলেন পদ্মবনে। পদ্মের মৃণাল বেয়ে সেই বীর্য পাতালে নামলো। সেখানে জন্ম হল মনসাকুমারীর। তিনি অযোনীসম্ভূতা শিবকন্যা। একদা শিব তাকে লুকিয়ে গৃহে আনলেন। কিন্তু বাদ সাধলেন চণ্ডী। শিবের অনুপস্থিতিতে চণ্ডী প্রচণ্ড রুষ্ট হয়ে মনসার এক চোক কানা করে দিলেন। মনসাও তাঁকে দংশন করে অচৈতন্য করে ফেললেন। অবশেষে শিবের অনুরোধে মনসা বিষ শোধন করলে চণ্ডীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হল। মনসার বয়সকালে শিব কন্যাকে পাত্রস্থ করলেন জরৎকারু মুনির সঙ্গে বিবাহ দিয়ে। মুনিও বিবাহের পরেই ক্রোধী মনসাকে পরিত্যাগ করে যান। মুনির আর্শীবাদে মনসার আস্তিকসহ অষ্টনাগ সন্তান জন্মালো। চণ্ডীর পরামর্শে শিব মনসাকে রেখে এলেন সান্তালি পর্বতে। নেতা তার রক্ষয়িত্রী। এই নেতারই পরামর্শে মনসা প্রথমে রাখালদেরকে বিপদে ফেলে পূজো আদায় করেন। পরে

মনসাপূজক রাখলদের সঙ্গে হাসান-হোসেনের বিবাদ বাধলে দেবী হাসানের পুরীর সবাইকে হত্যা করেন। সেখানেও তাঁর পূজা মেলে। অতঃপর জালু-মালুকে অনুগ্রহ করলেন। তাদের সমৃদ্ধি ঘটলো। এবার চাঁদ সদাগরের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হলেন তিনি। শৈব চাঁদ মনসাকে পূজা দিতে সম্মত হল না। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চাঁদের গুয়াবাড়ি ধ্বংস করলেন। বন্ধু শঙ্কর গারড়ির সাহায্যে গুয়াবন বাঁচালে মনসা কৌশলে শঙ্করকে হত্যা করলেন। নটী বেশ ধারণ করে চাঁদের মহাজ্ঞানও হরণ করে নিলে। চাঁদ চললেন বাণিজ্যে। কিন্তু সেখানেও মনসার চক্রান্তে সপ্ত ডিঙা মধুকর সমুদ্র ডুবে গেল, কোনক্রমে প্রাণে বাঁচালেন চাঁদ। যথেষ্ট নাকানি-চোবানি খেয়ে ঘরে ফিরে সংবাদ পেলেন সপ্তম পুত্র লখীন্দর জন্মগ্রহণ করেছে। কিছুকাল পরে তার বিবাহ দিলেন সায়বেনের কন্যা বেহুলার সঙ্গে। মনসা অনুচরী কালনাগিনীকে প্রেরণ করে বাসর ঘরে দংশন করিয়ে লখীন্দরকেও হত্যা করলেন। মৃত স্বামীর দেহ নিয়ে বেহুলা গাঙুড়ের জলে ভেসে চললো নানা প্রলোভন জয় করে। পরে নেতার সাহায্যে গিয়ে পৌঁছল স্বর্গলোকে। সেখানে নৃত্যগীতের মাধ্যমে দেবতাদের তুষ্ট করে মনসার দ্বারা স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে নিতে সমর্থ হল। শর্ত একটাই দাম্ভিক শৈব চাঁদকে মনসার পূজা দিতে হবে। স্বর্গলোক থেকে ফিরে বেহুলা সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়ে শ্বশুর চাঁদকে পূজা দিতে অনুরোধ জানালো। আপ্লুত চাঁদ বাম হাতে মনসার পূজা দিতে সম্মত হলেন। পূজার ফলে চাঁদের হৃত সম্পদ, মৃত সন্তানেরা প্রাণ ফিরে পেল। সেই থেকে মর্ত্যে মনসার পূজা ও মহিমা প্রতিষ্ঠিত হলো।

বিজয় গুপ্তের কাব্যবোধ যে যথেষ্ট ছিল তা তাঁর রচনাটি পড়লে বোঝা যায়। তবে তিনি গবীর ভাবানুভূতির তুলনায় বিদগ্ধ পাণ্ডিত্যের উপর বেশি নির্ভর করেছিলেন। এর ফলে রচনা কিয়ৎ পরিমাণে নীরস হয়ে গেছে। তিনি আখ্যানটিকে একটি সূত্রে বাঁধতে চেয়েছিলেন বলে মনে হয়। সূত্রটি হল দেবী মনসার মহিমা কীর্তন এবং পূজাপ্রাপ্তি। রাখালিয়া, জেলে-মালো, মুসলমান প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত নীচুবর্গের জনসম্প্রদায় পেরিয়ে উচ্চবিত্ত অভিজাত সমাজে কীভাবে মনসা স্বীকৃতি লাভ করলো তারই গল্প এখানে বিবৃত হয়েছে। গল্পে অলৌকিকতা যথেষ্ট থাকলেও কবি কাহিনীতে সমকালীন পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ছবি প্রতিফলিত করতে সক্ষম হয়েছেন। দেবী মনসা যেভাবে সমগ্র কাহিনীতে চক্রান্ত জাল বিস্তার করেছেন তার সঙ্গে চৈতন্যপূর্ব পাঠান আমালের রাজকীয় ষড়যন্ত্রময় পরিস্থিতির তুলনা চলে। মুসলমান কাজিরা হিন্দু প্রজার উপর যে-ধরনের অত্যাচার করতো তার আভাস যে মেলে হাসান-হোসেনের পালায়। এছাড়া টুকরো টুকরো আখ্যানে খুঁজে পাওয়া যাবে ধনীর বিলাসিতা, জমিদারী সংঘর্ষ, বাল্যবিবাহ প্রথা, গুপ্তহত্যা, সমকালীন বিবাহ রীতি ইত্যাদির প্রসঙ্গ। বিজয় গুপ্তের সবচেয়ে কৃতিত্ব বোধহয় এইটাই যে তিনি ধর্মমূলক আখ্যান বিবৃতিতে সমাজসচেতন প্রখর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিকে অস্বীকার করেননি। দেবখণ্ড ও নরখণ্ডের গল্প উপস্থাপনায় সেযুগের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, পোষাক-পরিচ্ছদ, আহার, রন্ধন প্রণালী ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র তুলে ধরেছেন। কাব্যে বাস্তবধর্মিতার এতটা প্রভাব থাকায় বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ পাঠককে তার বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে বেশি মাত্রায় যুক্ত করে ফেলে। হয়তো, তাঁর রচনা জনপ্রিয় হয়ে ওঠবার এটা একটা লুকোনো রহস্য।

চরিত্রসৃষ্টিতে বিজয় গুপ্তের পৈনণ্য যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। দেব ও মানব দুই শ্রেণীর চরিত্র রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। এক নিরিখে বিচার করলে বলতে হয়, বিজয় গুপ্ত প্রকৃতপক্ষে মানবজীনরেই কবি। তিনি স্বর্গের দেবতাকেও দোষেগুণে মানুষের মতো প্রবৃত্তিতাড়িত রক্তমাংসের জীবন্ত চরিত্র করে তুলেছেন। উদাহরণ—মনসা, শিব, চণ্ডী। মনসা তাঁর কাব্যে গোত্রপরিচয়ে দেবী বটে, কিন্তু স্বভাব-পরিচয়ে রাক্ষসী, দানবী। তাঁর মতো ক্রুর প্রতিহিংসাময়ী খল ষড়যন্ত্রকারিণী কোন দেবীকেই ভারতীয় পুরাণে পাওয়া যায় না। মঙ্গল কাহিনীতেও দেখা যায় তিনি ছলে-বলে কৌশলে পূজা আদায় করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এক্ষেত্রে কোন নীতিবোধ, বিবেকের দংশন তাঁর

পথ রোধ করে দাঁড়ায়নি। কবি দেখিয়েছেন যে দেবীর বিড়ম্বিত জীবনের নানা ঘটনার মধ্যেই ছিল এই ক্রুর প্রতিহিংসার বীজ। যিনি আকস্মিক বীর্যপতনের ফল, যাঁর শৈশবে মাতৃস্নেহ কপালে জোটে না, বিমাতা একচক্ষু কানা করে দেন রোষে, দেবকন্যা হয়েও বিবাহ হয় মুনি তনয়ের সঙ্গে, যাঁর ভাগ্যে স্বামীসুখ সয় না, দেবসমাজে ঠাঁই না পেয়ে বাস করতে হয় নির্জন পর্বতে—তাঁরগ মনে ক্ষোভ, রোষ, দুঃখ, অভিমান, বেদনা জন্ম নেওয়া স্বাভাবিক। এর থেকে তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সূচনা এবং সে সংগ্রামে তাঁর কোনো বৈধ রণনীতি নেই। অপূর্ব মনস্তাত্ত্বিক ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে কবি এইভাবে চরিত্রটির বাস্তব প্রতিষ্ঠা দেওয়ায় মনসা হয়ে উঠেছেন বিজয় গুপ্তের কাব্যের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিন্দু। শিবও সমানবাবে কবির কাব্যে দেবত্ব পরিহার করে রক্তমাংসের মানুষে পরিণত। তাঁর চরিত্র বৈশিষ্ট্য রঙ্গপটুত্ব, স্ত্রৈণতা তাঁকে সাধারণ মানুষের স্তরে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। চণ্ডী পৌরাণিক মহিমা থেকে স্খলিত হয়ে বাঙালি পরিবারের স্বার্থকুটিল গৃহবধূতে পরিণত। কবির চাঁদ চরিত্রে বীর্যবত্তার অভাব নেই, কিন্তু তিনি শেষরক্ষা করতে পারেননি। সনকার পুত্রহারানোর হাহাকার যথেষ্ট আবেদনময়। এদের তুলনায় আরো ভালো ফুটেছে বেহুলা। সতী নারীর আদর্শে কবি তাকে এঁকেছেন। অবিচলিত চিত্তে সমস্ত আঘাত বরণ করায় তার প্রেম মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে উঠেছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে বিজয় গুপ্তের পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর কাব্যে তাই বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও আলংকারিক কলাকৌশলের প্রয়োগ বেশি দেখা যায়। তাঁর কয়েকটি বিদগ্ধ বাচনভঙ্গী আজও বাংলার জনজীবনে প্রবচনের মর্যাদালাভে সমর্থ হয়েছে—'যেই মুখে কণ্টক বৈসে সেই মুখে খসে' কিংবা 'অতি কোপে করিলে কাজ ঠেকে আথান্তর। অতি বড় গাঙ্ হইলে ঝাটে পড়ে চর ॥' রসসৃষ্টিতেও বিজয় গুপ্ত স্বাদবৈচিত্র্যের পরিচয় রেখেছেন। মনসামঙ্গলের মূল আখ্যানটি করুণ রসে অভিসিক্ত। কবির বর্ণনায় তার উচ্ছলন লক্ষ করা যায়। কিন্তু তার পাশাপাশি হাস্যরসের একটি স্মিত প্রবাহ সমগ্র কাব্যশরীরে বয়ে চলেছে। চণ্ডী ও শিবের কপট প্রণয়, ডোম নারীকে দেখে শিবের কামাসক্তি, পদ্মার বিবাহ সম্বন্ধে শিবদুর্গার রহস্যালাপ, গণকের ছদ্মবেশে নারদের ভূমিকা, ভাসান পালায় মর্মস্পর্শী কারুণ্যের মধ্যেও গোদার আকৃতি, উক্তি ও আচরণ যথেষ্ট হাস্যরসের আমদানি করে। কবি রঙ্গরস পরিবেশন করতে গিয়ে কোথাও কোথাও শোভনতার বেড়াও টপকে গিয়েছেন। আদিরসের প্রতি বিজয় গুপ্তের আকর্ষণ ছিল এবং সেটা বোধহয় যুগরুচির দাসত্বের কারণেই। কেউ কেউ তাঁর কাহিনী বিন্যাসে দেখেছেন সামঞ্জস্যের অভাব। এর কারণ বোধহয় জীবনের বহির্ভাগের খণ্ড খণ্ড কাহিনীর উপর তাঁর অধিক নির্ভরতা। এ বি,য়ে ড. ভূদেব চৌধুরী লিখেছেন, 'বিজয় গুপ্তের আগাগোড়া কাব্যে সামগ্রিকতাবোধজনিত ভাবসাম্যের অভাব রয়েছে বলে মনে করি। আসলে বিজয়গুপ্ত ছিলেন যুগসন্ধির কবি। বিভিন্ন এবং বিচিত্র ধরনের উপাদানকে একই চরিত্রের মধ্যে সংহতি দান করা বা বিভিন্ন চরিত্রকে ভাবৈক্যে নিবিষ্ট সামগ্রিকতা দান করবার মতো সংসক্ত জীবনাবাণীর সঞ্চয় কবির ছিল না। তাই ঐক্য অপেক্ষা বৈচিত্র্যের প্রতি, সংহত অখণ্ডতার চেয়ে বিচ্ছিন্ন স্বয়ংপূর্ণতা সৃষ্টির প্রতি তাঁর প্রবণতা ছিল সর্বাধিক। এই জন্যেই দেখি, বিজয় গুপ্তের কাব্যের বিভিন্ন পালা বিভাগের যেন আর অন্ত নেই—আর প্রতিটি পালাই এক-একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কাহিনী।' তবে ছন্দের ক্ষেত্রে বিজয় গুপ্তের কাব্য প্রশংসার দাবি রাখে। দলবৃত্তের চারমাত্রায় চাল বজায় রেখে পয়ারেরই দ্রুত লয়ের কিছু পংক্তি রচনা করে কবি ছন্দোবৈচিত্র্যের আভাস দিয়েছিলেন। যেমন—'প্রেতের সনে/শ্মশানে থাকে/মাথায় ধরে/নারী। সবাই বলে/পাগল পাগল/কত সৈতে/পারি ॥' দেশী শব্দের প্রয়োগেও কবির কুশলতা প্রশ্নাতীত। মনে রাখতে হবে, বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ সমগ্র মঙ্গলসাহিত্যের ধারার মধ্যে প্রথম সনতারিখযুক্ত রচনা। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে বলতে হয়, তিনি মঙ্গল কাব্যের যে চাহারা ও চরিত্র বেঁধে দিয়েছিলেন অল্পবিস্তর রূপান্তরসহ সেটাই দীর্ঘ চারশো বছর ধরে অনুসৃত হয়ে এসেছে। কবির এই কৃতিকে খাটো করবার মতো অন্য কোন বিরুদ্ধ প্রমাণ সংশয়বাদীদের হাতে এখনও এসে পৌঁছয়নি।

৬.৩.৩ বিপ্রদাস পিপিলাই

পূর্ববঙ্গে পদ্মাপুরাণের বিশিষ্ট কবি হিসেবে যেমন বিজয় গুপ্ত উল্লেখিত হন, তেমনি পশ্চিমবঙ্গের মনসামঙ্গলের অন্যতম রচয়িতা হিসেবে বিবেচিত হন বিপ্রদাস পিপিলাই। ড. সুকুমার সেনের মতে, বিপ্রদাসই মনসামঙ্গলের সবচেয়ে পুরনো কবি। কিন্তু তাঁর দাবি অনেকেই মানতে চাননি, কারণ কাব্যের মধ্যে স্থাননামে ও ভাষায় যে আধুনিকতা প্রত্যক্ষ করা যায় তা প্রাচীনত্বের পরিপন্থী। যাইহোক, ড. সেন এসিয়াটিক সোসাইটি থেকে বিপ্রদাসের কাব্যটি সম্পাদনা করে বের করেছিলেন। বিপ্রদাস তাঁর কাব্যের নামকরণ করেছেন 'মনসাবিজয়'। কাব্যের মধ্যে গ্রন্থ রচনার সময়কালও নির্দেশিত হয়েছে। কবি লিখছেন—'সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ। নৃপতি হোসেন শাহা গৌড়ের সুলতান ॥ হেনকালে রচিল পদ্মার ব্রতগীত। শুনিয়া বিবিধ লোক পরম পীরিত ॥' এই হেঁয়ালীধর্মী নির্দেশ থেকে ১৪১৭ শক বা ১৪৯৫ খ্রিষ্টাব্দ পাওয়া যায়, যে-সময়ে বাংলার মসনদে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ অধিষ্ঠিত। কবির কাব্যের যে-তিনটি পুথি পাওয়া গিয়েছে তার প্রত্যেকটিতে এই একই সন তারিখ পাওয়ায় এটা তর্কাতীতভাবে ধরে নিতে হচ্ছে যে কবি পঞ্চদশ শতকের শেষভাগেই কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। কেবল কাব্যরচনার কাল নয়, কবি আত্মপরিচয় দিয়েছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে কবি সামবেদীয় পিপ্পলাদ শাখার বাৎস্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর পিতার নাম মুকুন্দ পণ্ডিত। বাস করতেন নাদুড়্যা বটগ্রামে। এটি বর্তমানে উত্তর চব্বিশ পরগণার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত। কাব্যে ব্যবহৃত কিছু অঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ থেকেও ঐ স্থান কবির জন্মস্থান রূপে সনাক্ত করা যায়।

বিপ্রদাসের কাব্যের কাহিনী বিজয় গুপ্তের তুলনায় বেশ স্বতন্ত্র, বিশেষ করে এর সূচনাংশ। প্রথমেই রয়েছে শিব-গঙ্গার বিবাহ প্রসঙ্গ। দৈত্যবধে আনন্দিত দেবতারা দৈত্যসূয় যজ্ঞে রন্ধনের জন্য শান্তনু ঋষির পত্নী গঙ্গার ডাক পড়ে। শর্থ থাকে যে, যজ্ঞশালায় গঙ্গা রাত্রিবাস করতে পারবে না। শিব সেই শর্তেই নিয়ে এলেন গঙ্গাকে। কিন্তু কাজকর্মের চাপে শর্ত রক্ষা করা সম্ভব হয় না। শান্তনুও স্ত্রী গঙ্গাকে আর ফেরত নিতে চাইলেন না। তখন অগত্যা শিবই বিয়ে করলেন গঙ্গাকে। শিবের পিতা ধর্ম। সেই ধর্মের দেখা পাওয়ার জন্য শিব বল্লুকা নদীর তীরে বারো বছর ধরে তপস্যা করে তবে পিতার দেখা পান। ধর্ম আদেশ দেন শিব যেন পদ্মফুল তুলতে কালীদহে যান। চণ্ডী শিবের সঙ্গে কালীদহে যেতে চাইলে শিব নানা কৌশলে তাঁকে নিরস্ত করেন। একদিন ফুল তোলবার সময়ে মদনপীড়া অনুভব করায় শিবের বীর্যপাত হলো। একটি কাক তা উদরস্থ করতে গিয়ে অপারগ হয়ে উগরে দিল। সেটি জলে পড়ে পাতাল ভেদ করে পৌঁছল বাসুকী নাগের জননী নির্মাণির মাথায়। তিনি ঐ ক্ষীরের মতো দ্রব্য দিয়ে একটি পুতুল গড়ে তার জীবন্যাস করে বাসুকীর কাছে দিলে মনসা নাগেদের বিষভাণ্ডারের অধিকারিণী হয়ে উঠলেন। এরপর বাসুকী তাকে রেখে এলন কালীদহে। এখানেই পিতা শিবের সঙ্গে দেখা হল মনসার। শিবকে দেখে মনসা জেদ ধরলেন পিত্রালয়ে যাবার। কিন্তু শিব চণ্ডীর ভয়ে প্রথমে রাজি হলেন না, পরে ফুলের সাজির মধ্যে লুকিয়ে আনলেন বাড়ীতে। ফল যা ঘটবার তাই ঘটলো। চণ্ডীর সঙ্গে মনসার বিবাদ শুরু হলো। এরপ কবি মূল কাহিনীটিতে তাঁর কল্পিত শাখা কাহিনীটি জুড়ে দিয়েছেন। মূল গল্পের মধ্যে মধ্যে আরেও কিছু নতুন প্রসঙ্গ আছে। তবে সেগুলি এতটা অভিনব নয়। সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'-এর প্রথম খণ্ডে পুরো ঘটনাধারা বিবৃত করে মন্তব্য করেছেন, 'মনসার কাহিনী সম্পূর্ণ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বিপ্রদাসের কাব্যেই মিলে। অন্য মনসা-মঙ্গল কাব্যে হয় কোন কোন আখ্যান মোটেই নাই, নয় কোন কোন আখ্যান অপেক্ষাকৃত অল্পতর অথবা বৃহত্তর আয়তন লইয়াছে। বিপ্রদাস ছাড়া সব কবি—যাঁহাদের রচনা পুরা মিলিয়াছে—বেহুলা-লখিন্দরের আখ্যানেই পূর্ণ মনোযোগ দিয়েছেন। তাই তাঁহাদের রচনায় পূর্ণ আখ্যানগুলি অনাদৃত এবং সেগুলির যোগসূত্র অতীব

ক্ষীণ।' অর্থাৎ গল্পে সঙ্গতিবিধানের দিক থেকে বিপ্রদাস অন্য কবিদের তুলনায় এগিয়ে। বর্ণনায় কবি উৎকট আতিশয্যকে বর্জন করেছেন, ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন। হাসান-হোসেন পালাটি বিজয় গুপ্তের তুলনায় বেশী দীর্ঘ এবং সুপরিকল্পিত। মুকুন্দ চক্রবর্তীর আগে মুসলমান সমাজের চিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কেবল এ কাব্যেই লভ্য। এ কবি পণ্ডিত হলেও কোথাও পাণ্ডিত্য প্রকাশ করতে গিয়ে কাব্যকে অযথা গুরুভারবিশিষ্ট করে তোলেননি।

চরিত্রসৃষ্টিতেও বিপ্রদাস কিঞ্চিৎ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। দেবতাকে নিয়ে মানুষ গড়ার চেষ্টা করেননি। তারা আগাগোড়া স্বাভাবিক সুসঙ্গত। মনসার চরিত্রে কঠোরতা নির্মমতা থাকলেও স্থানবিশেষে করুণা ও স্নেহমমতার সঞ্চার ঘটিয়েছেন। তবে কবি সমালোচিত হবেন চাঁদ চরিত্রের জন্য। চাঁদের পৌরুষ সেভাবে দীপ্তিমান নয়। বরং কাহিনীর শেষে চাঁদকে অনতপ্ত করে যেভাবে মাতা নত করিয়ে দেন তাতে চাঁদ চরিত্রে সামঞ্জস্য বিঘ্নিত হয়। এমর্মাকি চাঁদ মনসার কাছে শাস্তিপ্রার্থনা করে বলেছে, 'মস্তক উপরে করো চরণ প্রহার। দোষ নিন্দা এবে শাস্তি হউক আমার।।' বিপ্রদাসের মনসা ছলনা করে বেহুলাকে বাসরঘরে বিধবা হওয়ার অভিশাপ দেয়। বেহুলা ও সনকা চরিত্র অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল। ঘরোয়া পরিবেশ সৃষ্টিতে কবির নৈপুণ্য সত্যই অভিনন্দনযোগ্য। রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে করুণ ও হাস্য দু'প্রকার রসে কবির অনায়াস দক্ষতা দেখা গেছে। লখীন্দরের মৃত্যু হলে মনসার শোক কবির কলমে এইরকম—'চিয় রে প্রাণের পুত্র দেও সম্ভেবাধন। পড়িল ধরণীতলে হরিয়া চেতন।। উঠ উঠ লখিন্দর সোনার পুতলি। পূর্ণিমার চন্দ্র পূনি কারে দিনু ডালি।।'

বিপ্রদাসের কাব্যটির বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ উঠেছে এর আধুনিকতাকে ঘিরে। ড. সেনের প্রাচীনত্বের দাবি সেইসব কারণে নস্যাৎ হয়ে যায়। কবি চাঁদের বাণিজ্যত্রার প্রসঙ্গে যেসব স্থান নামের উল্লেখ করেচেন তার মধ্যে বেশ কিছু ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের সৃষ্টি। যেমন—নিমাইতীর্থ শ্রীপাট খড়দহ। বাকি কয়েকটি স্থাননামও সংশয়ের বাইরে নয়। যেমন—ভাটপাড়া, কাঁকিনাড়া, ইছাপুর, রিষড়া, কোন্নগর, এড়েদহ, চিৎপুর, কলকাতা। কাব্যের ভাষাতেও কেউ কেউ দেখেছেন আধুনিকতার ছাপ। যৎকিঞ্চিৎ উদাহরণ—'তপত কাঞ্চন জিনি দেহের বরণ। পট্টবস্ত্র পরিধান সূর্যের কিরণ।। চরণে নূপুরধ্বনি বাজে রুণুঝুণু। নানা রত্নে মণিময় দীপ্ত করে তনু।।' এগুলি কি প্রক্ষিপ্ত বলে মেনে নেওয়া সঙ্গত হবে? সমস্ত দিক বিবেচনা করে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাই বিপ্রদাসের মনসাবিজয়কে ষোড়শ শতাব্দীর রচনা বলে গণ্য করেছেন।

৬.৩.৪ নারায়ণ দেব

নারায়ণ দেবের কাব্য কোন্ সময়ে লেখা হয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে জানা না গেলেও অধিকাংশ সাহিত্য-ঐতিহাসিক তাঁকে চৈতন্য-পূর্ববর্তী কালের কবি বলে নির্দেশ করেছেন। এই কবির কাব্যের অনেকগুলি পুথি পাওয়া গিয়েছে। প্রায় অধিকাংশ পুথিতে তাঁর সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় পাওয়া যায়। কবির বিবরণের নিষ্কর্ষ এই—একদা কবির পিতামহ উদ্ধারণদেব রাঢ় দেশ ত্যাগ করে ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বোর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। কবির পিতার নাম নরসিংহ, মাতা রুক্মিনী। তাঁর মাতামহ প্রভাকর। কবিরা জাতিতে কায়স্থ এবং গোত্রে মৌদ্গল্য। পূর্ব্ববঙ্গের কবি হিসাবে তিনি পদ্মাপুরাণই লিখেছেন। এঁর লেখা গ্রন্থ শ্রীহট্টেও বেশ প্রচলিত। এজন্য শ্রীহট্টের অধিবাসীরা বলে থাকেন যে কবির জন্মস্থান শ্রীহট্টেই। আসলে ব্রহ্মপুত্রের তীরে বোরগ্রাম একদা শ্রীহট্টের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, বাংলাদেসের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে একমাত্র যে-কবির কাব্য অন্য রাজ্যে অন্য ভাষাভাষীর মধ্যে বিপুল প্রচার লাভ করেছে তিনি হলেন এই নারায়ণ দেব। এঁরকাব্য আসামে অসমীয়াদের মধ্যে সুপ্রচলিত। অবশ্য তার ভাষা অসমীয়া। দুটি রচনা পাশাপাশি রাখলে বোঝা যায় একটি আর একটির ভাষান্তরিত রূপমাত্র। আসামে বহু প্রচলনের কারণে সেখানকার সাহিত্য-ঐতিহাসিকেরা নারায়ণ দেবকে তাঁদের কবি বলে দাবি করেছেন।

সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যে নারায়ণ দেবের যে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল সেটা তাঁর কাব্য পাঠ করলে বোঝা যায়। তাঁর পদ্মাপুরাণে লৌকিক উপাদানের চাইতে পৌরাণিক উপকরণ বেশি মেলে। কবি কালিকাপুরাণ, শিবপুরাণ , মহাভারত, কুমারসম্ভভব প্রভৃতির দ্বারা কল্পনার ক্ষেত্রে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কোথাও কোথাও কালদাসের বর্ণনাভঙ্গিও অনুসরণ করতে প্রয়াসী হয়েছে। তবে, বলাবাহুল্য, সবক্ষেত্রে সফলকাম হতে পারেননি। লৌকিক পৌরাণিক সংস্কৃতির সমন্বয় চেষ্টা, যা কিনা তুর্কী আক্রমণোত্তর বাংলার মুখ্য অভিপ্রায় ছিল, নারায়ণ দেবের রচনার সেটা সার্থকভাবে ধরা পড়েছে। কবির কাব্যে বৈষ্ণবীয় প্রভাবও কম নয়, যার নিদর্শন ধুয়াতে বৈষ্ণবপদের ব্যবহার।

নারায়ণ দেবের কাব্য তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডটিতে কোন আখ্যান নেই, কেবল আত্মপরিচয় ও দেববন্দনা। দ্বিতীয় খণ্ডে আখ্যান থাকলেও চাঁদবণিকের গল্প সেখানে নেই, রয়েছে বিভিন্ন পৌরাণিক আখ্যান। আখ্যানগুলি তিনি বিভিন্ন পুরাণ ও মহাকাব্য থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। আর তৃতীয় খণ্ডে জায়গা পেয়েছে চাঁদ মনসা-বেহুলা-লখিন্দরের পরিচিত গল্পটি। কবির কাব্য অন্যান্য মনসামঙ্গলকাব্যের তুলনায় বড় হলেও দেবলীলার তুলনায় নরলীলা সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। অত্যধিক পুরাণনির্ভরতার খেসারত দিতে হয়েছে চরিত্র রচনাতেও। কবি মানবচরিত্রগুলির প্রতি যত্নশীল হতে পারেননি। তবে তাঁর চাঁদ ও বেহুলা যথেষ্ট কৃতিত্বের দাবী রাখে। মনসামঙ্গলের অন্যান্য কবিরা চাঁদ চরিত্রে অনমনীয় পৌরুষ ও দেবীর কাছে আত্মসমর্পণের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারেননি। এদিক থেকে নারায়ণ দেব খুবই সতর্ক ও সম্পন্ন শিল্পচেতনার পরিচয় রেখেছেন। চাঁদ মনসাকে পূজা দেয় বটে তবে দেবীর কাছে কবুল করে—'পিচ দিয়া বাম হাতে তোমারে পূজিব।' সাড়ম্বরে পূজার পরিবর্তে বাম হাতে পিছন ফিরে ফুলজল দেওয়া চাঁদের দৃঢ় মনোভাবের সঙ্গে পূর্বাপর সঙ্গতিপূর্ণ। এখানে চাঁদের মুখে কোন অনুতাপ বাক্য বসাননি কবি। বেহুলার ক্ষেত্রে কবি দেখিয়েছেন যে, সে স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনার পর জননী সুমিত্রার কাছে মুহূর্তের জন্য দেখা দিয়ে তাঁর চোখের বাইরে চলে গেছে। একটি পত্রে সে আত্মপরিচয় লিখে রেখে স্বামীর সঙ্গে স্বর্গারোহন করেছে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য এই বিষয়টিকে রূপক হিসেবে দেখবার পক্ষপাতী। তিনি লিখেছেন , 'যেদিন বেহুলা প্রথম গাঙ্গুরের ভাসানে মৃতের সহযাত্রিনী হইয়াছে, সেইদিন হইতেই সে চিরতরে জীবিতের সমাজের বাইরে চরিয়া গিয়াছে। সেইদিন তাহার সহমরণ হইয়াছে। অতএব তাহার প্রত্যাবর্তন একটা রূপকের মতো। কবি নারায়ণ দেব ইহাই কল্পনা করিয়া প্রত্যাগত বেহুলাকে মুহূর্তের জন্য মাত্র সমাজের কল্পনা চক্ষুর সম্মুখীন করিয়া পুনরায় স্বর্গলোকে নিরুদ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।' কবির কাব্যে পাণ্ডিত্যের সঙ্গে মিশেছে সরলতা ও স্বভাবিকতা। চরিত্রে অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুটনে তিনি ঘটনাবর্ণনার মাঝে মাঝে বিশেষ মুহূর্ত সৃষ্টি করেছেন। করুণ রসের উপস্থাপনায় নারায়ণ দেব বিশেষ প্রশংসার অধিকারী। মনসা ও বেহুলার অন্তর্ভেদী হাহাকার তাঁর কাব্যে উচ্চ স্বরগ্রামে গিয়ে পৌঁচেছে। তাঁর বেহুলা ব্রীড়াশীলা নারী হয়েও নির্মম দৈবশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামশীলা। মৃত স্বামীকে নিয়ে ভেসে যাওয়ার সময় তার মর্মস্পর্শী বিলাপ করুণরসে পাঠকের মনকে আর্দ্র করে দেয়। স্বামীর মৃতদেহকে সম্বোধন করে সে বলে—'জাগ প্রভু কান্দী নিশাচরে। ঘুচাও কপট নিদ্রা ভাসি সাগরে।। তুমি ত আমার প্রভু আমি যে তোমার। মড়া প্রভু নহ রে তুমি গলার হার।।' ড. ভট্টাচার্যের মতে, 'করুণরসের স্বাভাবিক বর্ণনায় নারায়ণ দেবের সমকক্ষ বড় কেহ নাই।' কিন্তু কবি করুণরসের সমান দক্ষতায় হাস্যরসও সৃষ্টি করেছেন। রঙ্গব্যঙ্গমূলক বক্রোক্তি রচনাতে তিনি সিদ্ধহস্ত। ডোমনী বেশিনী চণ্ডীর সঙ্গে শিবের রঙ্গপরিহাস তো সব কবির তামাসা প্রকাশের এক প্রিয় কাব্যপ্রসঙ্গ। নারায়ণ দেবের কলমও সেখানে হাসির ছটায় ঝিকমিক করে উঠেছে। একটু দৃষ্টান্ত :

ডুমুনি বলে দাড়ি পাকাইলা কি কারণ ।
নারীর উপরে এখন হে দেহ মন।।
বানরের মুখে যেন ঝুনা নারিকেল।
কাকের মুখেতে যেন দিব্য পাকা বেল।।
বৃদ্ধ হইলে পাইকের ভাবকী মাত্র সার।
তোমার মুখে চাহ আমাক বশ করিবার।।

কোন কোন সমালোচক কবিকে অভিযুক্ত করেছেন আদিরসের স্থূলতার জন্য। বিবাহবাসরে সমাগতা নারীগণের পতিনিন্দা মঙ্গলকাব্যের এক অত্যাবশকীয় উপদান। এখানেও কবি বেহুলার বিবাহে উপস্থিত বৃদ্ধাগণের নির্লজ্জ কামাসক্তি প্রকাশের হাস্যকর বর্ণনা করেছেন। এছাড়া কাব্যের অনেক জায়গায় কামাবেশের উপস্থাপনা আছে। নাবালক লখিন্দরের মধ্যেও আদিরসের বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করা যায়। এজন্য কেউ কেউ নারায়ণ দেবের রুচির প্রশ্ন তুলেছেন। এক্ষেত্রে আমাদের মনে হয়, কবি পুরাণের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই আদিরসের উতরোল বর্ণনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। তাছাড়া ছিল যুগরুচি। এর কাছেও কবিকে হার মানতে হয়েছে।

কোন কোন সাহিত্য সমালোচক নারায়ণ দেবকেই মনসামঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবির শিরোপা দিতে চান। তাঁদের যুক্তি, এ কবির কাব্যে কাহিনী, চরিত্র, রস সৃষ্টি, পাণ্ডিত্য ইত্যাদি বিষয় সুচারুভাবে মিলে মিশে চমৎকার কবিত্বে পরিণত হয়েছে। এজন্যই কি এ কবির কাব্যের অনুলিপি এত বেশি? ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণে বাস্তবিক মহাকাব্যের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু যুগধর্মের জন্য তাহা ততটা সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই।' পরবর্তীকালে যাঁরা পদ্মপুরাণ লিখেছেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নারায়ণ দেব কর্তৃক প্রভাবিত হন। দ্বিজ বংশীদাস এঁদের মধ্যে অন্যতম। নারায়ণ দেব পূর্ববঙ্গে ও আসামে 'সুকবিবল্লভ' নামে পরিচিত। কবির পূর্বপুরুষ ও উত্তরপুরুষদের যে বংশ লতিকা মিলেছে তার সূত্রে নারায়ণদেবকে ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধের কবি বলে নির্দেশ করা সঙ্গত।

৬.৪ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ধারা

চণ্ডীমঙ্গলের আরাধ্যা দেবী হলেন চণ্ডী। এই দেবীর উদ্ভবের ইতিহাসও মনসার মতো বিচিত্র। লৌকিক এবং পৌরাণিক উভয় সংস্কৃতির সঙ্গে চণ্ডীর যোগ আছে বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। সভ্যতার কোন্ পর্বে চণ্ডী উদ্ভূত হয়েছিলেন সে নিয়েও গবেষক মহলে সংশয় বর্তমান। সাপের সঙ্গে মনসার যেমন প্রত্যক্ষ যোগ আছে, সেভাবে চণ্ডীকে সরাসরি কোন টোটেমের সঙ্গে যুক্ত করা যায় না। কালকেতুর আখ্যানে তিনি অরণ্যপশুর রক্ষয়িত্রী দেবী, ধনপতি-পালায় তিনিই আবার হারানো-প্রাপ্তির দেবতা, তাঁর বরে ধনসম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে সদাগরের গৃহ। চণ্ডীমঙ্গলে দেবী ছলনা করার জন্য নানা সময়ে নানা রূপ ধারণ করেন—কখনো মৃগী, কখনো গোধিকা, আবার কখনো বা ষোড়শী বামার মূর্তি। তাই এই দেবীর উৎস নির্ণয় সহজসাধ্য নয়। তবে চণ্ডীর সঙ্গে যে অরণ্যের যোগ ছিল তা দুটো আখ্যানেই পরিস্ফুট হয়েছে।

পৌরাণিক সাহিত্যে ও বাংলার স্থাপত্যকলায় চণ্ডীর আবির্ভাব বহু প্রাচীন। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৮১-৯৩ অধ্যায় পর্যন্ত যা 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' নামে খ্যাত তা খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে লিখিত হয়েছিল বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন।

অর্বাচীন কালের পুরাণ বলে বিবেচিত স্কন্দপুরাণ, দেবীপুরাণ, বারাহীতন্ত্র, কালিকাপুরাণ, দেবী ভাগবত, বামন পুরাণ, বৃহৎ নন্দিকেশ্বর পুরাণ প্রভৃতিতে চণ্ডীর দেবীত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। অধিকাংশ গবেষকের ধারণা, দশম শতকের পূর্বেই চণ্ডীদেবীর প্রভাব ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রাচীন মূর্তিগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, এই দেবীর সঙ্গে গোধিকা উপস্থিত, কোথাও আবার গজলক্ষ্মীর মতো দুটি হস্তীও আছে। এর তাৎপর্য নির্ধারণ করতে গিয়ে চণ্ডীর আবির্ভাবের উৎসে পৌঁছে গিয়েছেন কেউ কেউ। সবাই যে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা নয়, তবুও তাঁদের ভাবনাগুলির সারাৎসার এখানে পেশ করা যেতে পারে।

ড. সুকুমার সেনের মতে, ভারতবর্ষে সুপ্রাচীন কাল থেকেই স্ত্রীদেবতা ও মাতৃকামূর্তির পূজা প্রচলিত হয়ে আসছে। ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্তে শক্তি সম্পকিচ্ছুত তত্ত্বচিন্তা প্রথম প্রকাশ করেছেন আর্য ঋষিগণ অম্ভভূণ ঋষির বাক্নাম্নী কন্যার উক্তিতে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৪৬ সংখ্যক সকূক্তে যে অরণ্যানীর উল্লেখ আছে তিনিই 'বহু শত শতব্দীর ইতহাস বাহিয়া নানা কবিকল্পনার রঙে ডুবিয়া ও বিচিত্র লোকভাবনার পাকে জড়াইয়া পুরনো বাঙ্গালা সাহিত্য চণ্ডীমঙ্গলের অধিদেবী মঙ্গলচণ্ডী রূপে দেখা দিয়াছিলেন।' এছাড়া ড. সেন মনে করেন, দুর্গার দুটি রূপ প্রাচীনকাল তেকে পাশাপাশি চলে আসছে। একটি রূপে তিনি পর্বতদুর্গের অধিষ্ঠাত্রী যোদ্ধ্রী, অন্যরূপে মরুকান্তারবাসিনী পালয়িত্রী। অবশ্য প্রথম রূপটিরই বাহন রূপে গোধাকে লক্ষ্য করি আমরা। অধ্যাপক সুধীভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয়ও সমানভাবে চণ্ডীর পৌরাণিক উৎসের প্রতি আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছেন। তিনি কালিকাপুরাণ, বিশ্বসারতন্ত্র, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে মঙ্গলচণ্ডীর রূপ, ধ্যান ও পূজাবিধির প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করেছেন। এমনকি ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে সংকলিত বলে অনুমিত বৃহদ্ধর্মপুরাণে চণ্ডীমঙ্গলের দুটি কাহিনীর আখ্যান যে বীজরূপে পাওয়া যায় তাও জানিয়েছেন। সেখানে বলা হয়েছে—

"ত্বং কালকেতুবরদাচ্ছল গোধিকাসি/যা ত্বং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকাখ্যা।
শ্রীশালবাহননৃপাদ্ বণিজং সসূনো/রক্ষোহম্বুজে করিচয়ং গ্রসতী বমন্তি।।

কিন্তু যে সমস্ত গবেষকগণ অনার্যদের নারীদেবতাকেন্দ্রিক ধর্মভাবনার মধ্যে চণ্ডীর উৎস সন্ধান করেন তাঁরা উপরোক্ত মত অস্বীকার করেন। চণ্ডীর এই অপৌরাণিক উৎসের অন্যতম প্রবক্তা হলেন নৃতাত্ত্বিক শরৎচন্দ্র রায়। তিনি বলেন, ছোটনাগপুরের ওঁরাও সমাজের দেবী 'চাণ্ডী' বাংলায় এসে চণ্ডী নাম ধারণ করেছেন। ওঁরাও যুবকদের পশুশিকারে সাফল্য ও যুদ্ধে জয়লাভের উদ্দেশ্যে চাণ্ডীবোঙ্গার পূজো করে। কালকেতু উপখ্যানে চণ্ডীর বারবার রূপ-পরিবর্তনের কথা মনে রেখে আশুতোষ ভট্টাচার্যও মনে করেন যে, চণ্ডীমঙ্গলের ব্যাধ কাহিনীর চণ্ডী ও ওঁরাও সমাজের দেবী চাণ্ডী অভিন্ন। এ দুই দেবীই অরণ্য পশুর হিতাকাঙ্খী। গবেষক-অধ্যাপক ড. পল্লব সেনগুপ্ত চণ্ডীর অনার্য উৎসের সন্ধানে প্রাচীন পৃথিবীর আদিম ধর্মচিন্তার দ্বারস্থ হয়েছেন। তিনি প্রাচীন মিশরের আইসিস, মেসোপটেমিয়ার ইশ্‌তার, গ্রীসের দিমিতর প্রমুখ প্রধান মাতৃকাদেবীদের সঙ্গে একসূত্রে বেঁধেছেন 'শাকম্বরী' দুর্গাকেও। ভারতবর্ষে এই শস্যদায়িণী মাতৃকাদেবীর আবির্ভাব আর্যানুপ্রবেশের পূর্বে। পৌরাণিক দুর্গার বোধনে নবপত্রিকার প্রতিষ্ঠা ও পূজা এই প্রাচীন শস্যদেবীর পরিচয় বহন করে। ড. সেনগুপ্ত লিখেছেন, 'দুর্গা তথা চণ্ডিকা যে একদা অরণ্যমণ্ডলেরই কোনো দেবী ছিলেন তার আরো একটি প্রমাণ হল তাঁর 'কোকমুখা' নামটি। কোক অর্থে ব্যাঘ্র (মতান্তরে বন্য কুকুর বা শৃগাল) স্পষ্টতই এই পশু ও মানবের সমন্বিতরূপ সংবলিত দেবীর কল্পনা সম্পূর্ণভাবে মানবিক মূর্তিসম্পন্ন দেবকল্পনার চেয়ে পূর্ববর্তী।'

চণ্ডীর উৎস সম্পর্কে প্রয়াত অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষীয়মান মহাযানী বৌদ্ধধর্মের একটি দেবীমূর্তির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে, বজ্রযানী বৌদ্ধরা 'বজ্রতারা' নামে যে দেবীর কল্পনা করেন, তিনিই হিন্দু রূপান্তরে চণ্ডী। বজ্রতারার নামে যে-ধ্যান পাওয়া গিয়েছে, তার একটি বৈশিষ্ট্যই শুধু মেলে মঙ্গলচণ্ডীতে। সেটি হল, দুই দেবীই অষ্টবাহুবিশিষ্টা।

এখন উপরোক্ত মতসমূহের মধ্য থেকে আমরা গ্রহণযোগ্য একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি। তার আগে কয়েকটি সম্ভাব্য অনুমান—১. মূল দেবী চণ্ডী এবং তাঁর নামটি যে অনার্য উৎসজাত এমন অনুমানের বিরোধী তথ্য এ যাবৎ পাওয়া যায়নি। ২. বেদে চণ্ডী নামটি অনুপস্থিত। ৩. কাব্যে দেখা যাচ্ছে, গোধিকারূপে কালকেতুর গৃহে প্রবেশ করেছেন চণ্ডী এবং গোধিকা কালকেতুর ভক্ষ্য এবং শেষ পর্যন্ত পূজ্য। টোটেমতত্ত্বের একটি মূল সূত্র এখানে পাওয়া যাচ্ছে বলে এর অনার্য উৎস বেশি করে ধরা পড়ে। ৪. ইনি অরণ্য পশুদের রক্ষা করেন ও এঁকে তুষ্ট করলে শিকারীদের সাফল্য আসে—এ দুটি ঘটনাও দেবীর আরণ্যক প্রকৃতির দিকে ইঙ্গিত করে। ৫. চণ্ডী ধনদাত্রী বটে। ৬. ধনপতির কাহিনীতে দেবী আরণ্যক প্রকৃতি বিসর্জন দিয়ে যোষিতামিষ্ট দেবীতে পরিণত। ৭. মশান তেকে ডাকিনী-যোগিনীর সহায়তায় চামণ্ডারূপিনী দেবী শ্রীমন্তকে যেভাবে উদ্ধার করেন সে-রূপের মধ্যে চণ্ডীর পৌরাণিক ও লৌকিক উপাদানের সমন্বয় ঘটেছে। অতএব সিদ্ধান্ত, চণ্ডীর রূপ, ভাব এবং ঐশ্বর্য কল্পনায় আর্য-অনার্য হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন-লৌকিক দেবপরিকল্পনার প্রভাব পড়েছে ইতহাসের বিভিন্ন ধাপে—বিভিন্ন সূত্রে। পৃথিবীর আদিম মাতৃকাদেবী শস্যশালিনীরূপে প্রথমে গৃহীতা হয়েছিলেন ভারতবর্ষের ধর্মচিন্তায়। অনার্য সংস্কৃতিতে ইনি অরণ্যজন্তুর রক্ষাকর্ত্রী ও সেইসূত্রে শিকার-সাফল্যেরও দেবী। ঋগ্বেদে এই বনদেবীই অরণ্যানী, যিনি অভয়া ও পশুমাতা। এরপর পৌরাণিক যুগে সুসংস্কৃত হয়ে ওঠেন, পৃথক পৃথক দস্যুবিনাশের গল্প গড়ে ওঠে তাঁকে ঘিরে। ব্রহ্মবৈবর্ত ও দেবী ভাগবতের একটি বিশিষ্ট উল্লেখ থেকে হিন্দু সমাজে চণ্ডীর অনুপ্রবেশের ক্রমটিকে অনুধাবন করা যায়। গ্রন্থদুটিতে বলা হয়েছে—চণ্ডী 'কৃপারূপাতিপ্রত্যক্ষা যোষিতামিষ্ট দেবতা'। অর্থাৎ চণ্ডী নারী-সমাজেরই দেবতা। এই তথ্য আরো দুটি প্রশ্নের দিকে ঠেলে দেয় আমাদের। চণ্ডী 'অনার্য-মূল' দেবী বলেই কি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের লোকচক্ষুর আড়ালে নারীদের প্রশ্রয়ে ধীরে ধীরে পাদপ্রদীপের সামনে আসতে হয়েছে তাঁকে? খুব সম্ভব তাই। তিনি যদি প্রতিষ্ঠিত পৌরাণিক দেবী হবেন তাহলে তাঁকে ঘিরে মঙ্গালকাব্য গড়ে উঠবে কেন? মনসা যেমন হয়ে ওঠেন শিবের কন্যা, চণ্ডী তেমনি রূপান্তরিত হন শিব-পত্নীতে। পরবর্তীকালে দক্ষকন্যা সতী ও হিমালয়কন্যা পার্বতীর সঙ্গে মিশে যান তিনি। চণ্ডীমঙ্গলে সেই সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

৬.৪.১ মাণিক দত্ত

চণ্ডীমঙ্গলের আদিকবি মাণিক দত্ত। এই কবির নাম জানা যায় ষোড়শ শতকের শেষভাগে আবির্ভূত কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর রচনা-সূত্রে। তিনি তাঁর কাব্যে বেশ কয়েকটি স্থানে মাণিক দত্তকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন—'মাণিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়। যারা হৈতে হৈল গীত পথ পরিচয়॥' কিংবা 'আদ্য কবি বন্দিলাম মহামুনি ব্যাস। মাণিক দত্তের দাণ্ডা করিয়ে প্রকাশ।।' মাণিক দত্তের লেখা চণ্ডীমঙ্গলের দুটি খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়েছে। তার একটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় ও অন্যটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। ১৯৭৭ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সুনীল কুমার ওঝা 'মাণিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল' সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন। সেই সূত্রে কাব্যটি সম্ভবন্ধে সবিশেষে জানতে পারা যায়।

মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কোন্ সময়ের রচনা তা এখনো নিঃসংশয়িত ভাবে স্থিরীকৃত হয়নি। এর প্রথম কারণ, যেসব পুথি পাওয়া গেছে সেগুলিতে কোথাও গ্রন্থরচনার সময়কাল নির্দেশ করা নেই। দ্বিতীয়ত, কাব্যে চৈতন্যদেব ও তাঁর অনুচরদের বিস্তৃত বর্ণনা থাকলেও এর সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনায় এমন প্রাচীনত্ব (বৌদ্ধ ও নাথধর্মের প্রভাব) লক্ষিত হয় যে, যে-কারণে আশুতোষ ভট্টাচার্য ধারণা করেন 'এই দেশের সমাজে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কার প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্বে মাণিক দত্তের কাহিনী রচিত হইয়াছিল।' অবশ্য কাব্যের ভাষা বিচার করে একে কখনোই ষোড়শ শতকের পূর্ববর্তী বলে নির্দেশ করা যায় না। বাংলাদেশে চণ্ডীপূজার ঐতিহ্য কত প্রাচীন? বৃহদ্ধর্ম-পুরাণের সাক্ষ্যে খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের পূর্বে একে স্থাপন করা যায়। চৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবন দাস চৈতন্যপূর্ববর্তীকালের নবদ্বীপের ধর্মচর্চার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন—'ধর্মকর্ম লোকে সভে এই মাত্র জানে। মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে।' সময়টা পঞ্চদশ শতকের চতুর্থপাদ। অনুমান করা যায়, ঐ সময়েও সমাজে চণ্ডীমঙ্গল প্রচলিত ছিল, নইলে এর 'জাগরণ' পালার উল্লেখ এভাবে স্পষ্টতা পেতো না। মাণিক দত্ত এই সময়কালের কবি হতেও পারেন।

মাণিক দত্ত কোথাকার লোক ছিলেন তা নিয়েও পণ্ডিতগবেষকরা অনুমান করেছেন। কবির নিবাস মালদহের ফুলবাড়ী গ্রামে ছিল বলে অধিকাংশ গবেষকের ধারণা। তাঁদের অনুমানের পিছনে কিছু বলিষ্ঠ যুক্তিও আছে। প্রথমত কবির যে দুটি পুথি মিলেছে তা মালদহ জেলা থেকেই। মালদহে এখনও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এই কাব্য পঠিত হয়। দ্বিতীয়ত, কবি কাহিনীর সূত্রে যেসব গ্রাম, নদনদী, মঠ-মন্দিরাদির নাম করেছেন তার বেশির ভাগ মালদহ জেলাতেই মেলে যেমন—ঝাড়গ্রাম, বড়গাছা, কাঞ্চন নগর, সন্ন্যাসী পাটন, ছাত্যাভাত্যার বিল,কেন্দুয়ার নালা, গৌড়েশ্বরীর মন্দির ইত্যাদি। তৃতীয়ত, পুথির ভাষায় মালদহের বাক্‌রীতির প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। কবির আত্মবিবরণী থেকে আর একুট তথ্য মেলে যে, কবি প্রথমজীবনে কানা ও খোঁড়া ছিলেন। পরে দেবীর কৃপায় তিনি এর থেকে মুক্ত হন। দেবী চণ্ডী তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে পুথি লিখতে স্বপ্নাদেশ দেন। দেবীর প্রসাদে কবিত্ব লাভ করে কাব্য রচনায় কবি আত্মনিয়োগ করেন। এরপর বোধহয় কবি গানের দল বাঁধেন রঘু ও রাঘব এই দুইজন দোহারকে সঙ্গে নিয়ে। এদের নিয়ে কবি কলিঙ্গাদেশে গিয়েছিলেন এবং সেখানে কলিঙ্গরাজের কুনজরে পড়ে কারারুদ্ধ হন। পরে চণ্ডীর কৃপায় মুক্তি লাভ করেন।

মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতু ও ধনপতির দুটি আখ্যানই আছে, তবে সংক্ষিপ্তাকারে এবং ধনপতির আখ্যানটি খণ্ডিত। সূচনায় রয়েছে সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা। কবির যাবতীয় কৃতিত্ব কিন্তু ঐ প্রথম অংশেই। ধর্মমঙ্গল ও নাথসাহিত্যের অনুরূপ সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা করেছেন বলে অনেকে মনে করেছেন যে তাঁর রচনাটি প্রাচীন। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, মালদহ অঞ্চলে প্রচলিত গম্ভীরার গানে ঐ ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। কবি গতানুগতি দেববন্দনা পরিহার করে হস্ত-পদ-মস্তকহীন ধর্মগোঁসাইয়ের জন্মকথা দিয়ে কাব্য শুরু করেছেন। ধর্ম গোলোকের ধ্যান করতে তাঁর মুণ্ড সংযোজিত হল। ক্রমে চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ ইত্যাদির সৃষ্টি হল। এরপর উৎপত্তি হল জলের। জলে ভাসতে লাগলেন নিরঞ্জন। নিরঞ্জন থেকে আদ্যার উৎপত্তি। মাণিক দত্ত এই আদ্যাকেই চণ্ডীতে পরিণত করেছে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর জন্মগ্রহণ করলে ধর্মের আদেশে মহাদেব আদ্যাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করলেন। এরপর কাহিনী মোড় নিয়েছে আদ্যা-চণ্ডীর পূজা প্রচার ও মাহাত্ম্য প্রখ্যাপনের দিকে।

মাণিক দত্তের কালকেতু ও ধনপতি পালার কাহিনী কিংবা চরিত্রে বিশেষ বৈচিত্র্য দেখতে পাওয়া যায় না। কেবল দক্ষযজ্ঞের বর্ণনা প্রসঙ্গে দেখা যায় যে, শিবনিন্দায় দক্ষপত্নী প্রসূতিও পঞ্চমুখ ছিলেন। ধনপতির গল্পে লহনা ও খুল্লনার সম্পর্ক বর্ণনায় কবি বেশ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। সেকালের সতিনীকোন্দলের যথার্থ রূপটি

এখানে ধরা পড়েছে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন যে, আখেটিক খণ্ডের তুলনায় কবির বণিক খণ্ডটি সুপরিকল্পিত, 'কিন্তু পুথির রচনা সর্বত্রই অত্যন্ত শিথিলবন্ধ, ছন্দ ও মিল সম্বন্ধে সর্বত্রই দায়িত্বহীনতা দেখা যায়।' মাণিক দত্তের চরিত্রসমূহ কোন অভিনবত্বের দাবিদার নয়। কেবল ভাঁড়ুদত্তের চরিত্রটি সামান্য পরিমাণে উজ্জ্বল। ড. সুকুমার সেনের মতে, 'কাব্যটি জনসাধারণের জন্য লেখা বলিয়া ছড়াবহুল'। মন্তব্যটি সঠিক। কবির বিভিন্ন বর্ণনায় ছড়াধর্ম পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। যেমন জরতীবেশিনী চণ্ডী হেঁয়ালি করে বলেছে—

'আমারে বোল ডানরে বুড়িয়ে আমার বোল ডান।
কার খাইনু ভাতার পুত কার করিনু হান॥
ডান নইরে ডান নই হইএ মুখদোষী।
দ্বারে বসে খাইনু মুঞি চৌদ্দ ঘর পড়শী॥...
ডাইন বলিঞা মোরে বোলে বার বার।
আজিকা হৈনু ডান তোমা খাইবার॥'

সবশেষ কথা এই যে, মাণিক দত্তের কাব্যে সুষম ঐক্যের অভাব আছে, এর ভাষা ও ছন্দ সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কাব্যে দু'একটি স্থানে মুকুন্দের ভাষাভঙ্গির নকল থাকলেও তা পরবর্তীকালের প্রক্ষেপ বলে ধারণা করা সঙ্গত।।

৬.৫ অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। মঙ্গলকাব্যগুলি উদ্ভবের পিছনে কারণসমূহ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

২। মনসামঙ্গল কাব্যধারা বিষয়ে আপনার অভিমত দিন।

৩। পদ্মাপুরাণের কবি বিজয়গুপ্তের কবিত্ব বিষয়ে আলোকপাত করুন।

৪। মনসামঙ্গল কাব্যধারায় বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের বিশিষ্টতা নির্দেশ করুন।

৫। মনসামঙ্গলকার নারায়ণদেব সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন।

৬। দেবী চণ্ডীর স্বরূপ নির্ধারণ করে চৈতন্য-পূর্ব যুগের চণ্ডীমঙ্গলকার মানিক দত্ত সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

মাঝারি প্রশ্ন :

১। 'মঙ্গল' নামকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

২। মঙ্গলকাব্যের স্বরূপ-লক্ষণগুলি উপস্থিত করুন।

৩। মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন প্রকারভেদ বিষয়ে আলোচনা করুন।

৪। দেবী মনসার উৎপত্তির ইতিহাস বিবৃত করুন।

৫। প্রথম মনসামঙ্গলকার কানা হরিদত্ত বিষয়ে আলোচনা করুন।

৬। চরিত্রসৃষ্টিতে কবি বিজয়গুপ্তের কৃতিত্বের পরিচয় দিন।

৭। বিপ্রদাসের কাব্য বিজয়গুপ্তের তুলনায় কতটা স্বতন্ত্র সে বিষয়ে আলোকপাত করুন।

৮। চণ্ডীর উৎস বিষয়ে সুচিন্তিত অভিমত দিন।

৯। মানিক দত্তের কাব্যের বিশিষ্টতা কোন্‌খানে আলোচনা করুন।

বস্তুমুখী প্রশ্ন :

১। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা কোন্ বর্গের?

২। মনসা তথা সর্প-সংস্কৃতির সূচনা কোন্ দেশে?

৩। 'মন্‌চা আম্মা' কোন্ গোষ্ঠীর দেবী?

৪। কানা হরিদত্ত কোথাকার লোক?

৫। বিজয় গুপ্তের কাব্যের রচনাকাল কত?

৬। বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের কাব্যের নাম কি?

৭। নারায়ণ দেব আসামে কি নামে পরিচিত?

৮। মাণিক দত্ত কোন্ অঞ্চলের কবি?

৬.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত ৩য় খণ্ড—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭১

২. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—শ্রীমন্তকুমার জানা, ১৯৯৪

৩. বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস—আশুতোষ ভট্টাচার্য, ১৯৯৮

৪. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড—সুকুমার সেন, ১৯৯১

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.